দৈনিক সংবাদ

তারিখ ....
পৃঃ ৫ কলাম ৭

একটি শিক্ষানীতির আকাঙ্ক্ষা এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০

ড. মোহাম্মদ হাননান

বাঙালি জনগণের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তার এবং একটি শিক্ষিত সিভিল সোসাইটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন থেকেই দেশের শিক্ষাবিদ, সচেতন নাগরিক এবং ছাত্রসমাজ সংগ্রাম করে আসছেন, সংগ্রাম করে চলেছেন এখনও। বৃটিশ শাসনের পর ১৯৪৭ সাল থেকেই এ লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছিল। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে নানা সময়ে অনেক সুপারিশ এবং প্রতিবেদনও তৈরি হয়েছে। কিন্তু কোন প্রতিবেদনই বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত বা প্রণীত হওয়ার সুযোগ পায়নি। বৃটিশ শাসনামলে বরং খারাপ-ভাল যা-ই হোক, তাদের মতো তারা শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিল এবং তা বাস্তবায়নও করেছে তারা। কিন্তু ১৯৪৭ সাল থেকে ইতিহাসটি একেবারেই ভিন্ন রকম, কোন শিক্ষানীতিই নেই, একটা শিক্ষানীতি ছাড়াই এ জাতি যেমন-তেমন করে বেড়ে উঠেছে, এটা বিস্ময়কর হলেও সত্য।

শিক্ষানীতি প্রণয়নের ইতিহাস

১৯৫০ : মাওলানা আকরাম খাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয় পূর্ববঙ্গ শিক্ষা সংস্কার কমিটি। পূর্ববঙ্গে তৎকালীন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার আরবি হরফে বাংলা ভাষা প্রাথমিক স্তর থেকে কিভাবে শুরু করা যায় প্রধানত সে সম্পর্কে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্যই এই কমিটি গঠন করেছিল। কিন্তু মাওলানা আকরাম খাঁ কমিটি আরবি হরফে বাংলা চালুর বিরুদ্ধেই সুপারিশমালা প্রণয়ন করেন। ফলে মুসলিম লীগ সরকার এই কমিটির রিপোর্ট কখনোই প্রকাশ করেনি।

১৯৫২ : মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের কালে ১৯৫২ সালে গঠিত হয়েছিল পূর্ববঙ্গ শিক্ষা কমিটি। কমিটি ১৯৫২ সালে তাদের সুপারিশ প্রণয়ন করেছিল। কিন্তু ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষা নিয়ে নতুন চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। ফলে এ রিপোর্ট সরকারের ফাইলেই পড়ে থাকে।

১৯৫৭ : মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের শাসনামলে ১৯৫৭ সালে গঠন করা হয় পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা কমিশন। কমিশন সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়ার পূর্বেই দেশে শুরু হয় সামরিক শাসন।

১৯৫৮ : পাকিস্তানের সামরিক সরকার ১৯৫৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি গঠন করে জাতীয় শিক্ষা কমিশন। পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব এস এম শরিফের নেতৃত্বে এই কমিশন ১৯৫৯ সালের ২৬শে আগস্ট অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করে এবং পুরো রিপোর্ট ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। এর বিরুদ্ধে ৬২ সালে ছাত্রসমাজ দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুললে তা শেষ পর্যন্ত বাতিল করা হয়।

১৯৬৪ : শরিফ কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের প্রেক্ষাপটে ১৯৬৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর আইয়ুবের সামরিক সরকার হামুদুর রহমান কমিশন নামে আরো একটি কমিশন গঠন করে। এটিও ছাত্র এবং জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়।

১৯৬৯ : ১৯৬৯ সালের ৬ জুলাই জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকার এয়ার মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে নতুন আরো একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধের কারণে এরও কোন পরিণতি ঘটেনি।

১৯৭২ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের উপযোগী একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ২৬শে জুলাই ড. কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। ১৯৭৩ সালের ৮ই জুন অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন হিসেবে তা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হওয়ার পূর্বেই উচ্চাভিলাষী সামরিক অফিসারদের দ্বারা সরকার পরিবর্তিত হয়ে গেলে স্বাধীন দেশের এই প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

১৯৭৮ : জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনামলে শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফরের আমলে ১৯৭৮ সালে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয় এবং মন্ত্রিত্ব থেকে কাজী জাফরের বিদায়ের পরে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আবদুল বাতেনের নামে প্রচারিত হলেও মূল প্রতিবেদনটি সেই সরকারের কাছেই গুরুত্বহীন করে রাখা হয়।

১৯৮৪ : এরশাদের সামরিক সরকারের আমলে ১৯৮৪ সালের পয়লা আগস্ট 'শিক্ষায় নতুন জীবন' শীর্ষক আবদুল মজিদ খানের শিক্ষানীতিমালার একটি প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে সারাদেশের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়লে তা বাতিল করা হয়।

১৯৮৮ : এরশাদের সামরিক শাসনামলে আরো একটি শিক্ষা কমিশন মফিজ উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে ১৯৮৭ সালের ২৩শে এপ্রিল গঠিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৮৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি রিপোর্ট প্রকাশিত হলেও এরশাদ সরকার কর্তৃক তা গৃহীত হয়নি।

১৯৯৭ : ১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেই ১৯৭২ সালের কুদরাত-ই-খুদা কমিশনের প্রতিবেদনের আলোকে তাকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে প্রফেসর শামসুল হককে প্রধান করে ১৯৯৭ সালের ১৪ই জানুয়ারি ৫৬ সদস্যের একটি নতুন কমিটি গঠিত হয়। একই বছর কমিটি তাদের রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দেয়। প্রতিবেদনটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নির্ধারণের জন্য সরকার ১৯৯৮ সালে ড. নজরুল ইসলামকে চেয়ারম্যান করে ৬ সদস্যের একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করে। ২০০০ সালের ২রা অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ এই প্রতিবেদন অনুমোদন করে। ২০০১ সালের ১৬ই জানুয়ারি জাতীয় সংসদে রিপোর্টটি উপস্থাপন করেন শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক এবং ২৮শে জানুয়ারি জাতীয় সংসদে তা গৃহীত হয়।

❑ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের ইতিহাসে এভাবে এই প্রথম একটি ঘটনা ঘটে। কারণ গত ৫০ বছরে এই প্রথম একটি শিক্ষানীতি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং জাতীয় সংসদেও তা গৃহীত হয়।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

❑ এই প্রেক্ষাপটেই ২০০০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির কয়েকটি দিক পর্যালোচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই দেখা যায়, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ১৫ দফা কার্যক্রমের সুপারিশ করা হয়েছে এই জাতীয় শিক্ষানীতিতে [জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০, পৃষ্ঠা-১]। এতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলার সুপারিশ করা হয়েছে, আবার শিক্ষার্থীকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন করে গড়ে তোলার কথাও উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে, শিক্ষার্থী যাতে শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে এমন শিক্ষাই তাদের দিতে হবে।

সকল জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতিতে। ২০০০ সালের মধ্যে দেশের সাক্ষরতার হার ৬৫.৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে। সাক্ষরতা কর্মসূচির এই বিশাল কর্মকাণ্ড পুরোটাই ঘটছে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে, যার পরিমাণ ৬শ ৮২ কোটি টাকা এবং এতে বিদেশী অর্থের কোনই সংশ্লেষ নেই। অন্যদিকে সাক্ষরতা কর্মসূচির বাস্তবায়ন হচ্ছে পুরোটাই সরকারি তত্ত্বাবধানে। অর্থায়নের বিষয়ে এবং তত্ত্বাবধানে সরকার সঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছিল বলে মনে করা যায়। কারণ এ দেশের নিরক্ষরতা দূর হয়েছে বিদেশী অর্থায়নে এবং বিদেশীদের তত্ত্বাবধানে– এমন সংবাদের চেয়ে এটাই উত্তম হয়েছে যে, বাঙালি জাতি শেষ পর্যন্ত যে সাক্ষরতা অর্জন করেছে তার পুরোটাই ঘটেছে তার নিজস্ব অর্থে ও নিজস্ব পরিচালনায়।

প্রাথমিক শিক্ষা

❑ প্রাথমিক শিক্ষার পূর্বে একটি এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতিতে। পাঁচ বছরের শিশুর জন্য বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য এর শিক্ষাক্রম পরিচালিত হবে। ২০০৫ সালের মধ্যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই কোর্স চালু করা হবে। [জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২]।

❑ দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় বিরাজমান বিভিন্ন ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনের কথা বলা হয়েছে এই জাতীয় শিক্ষানীতিতে। প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হয় প্রধানত সরকারি উদ্যোগে, তবে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও রয়েছে, এদেরও বড় অংশে অনুদান আসে সরকারি কোষাগার থেকে। এর বাইরেও রয়েছে কিন্ডার গার্টেন, এবতেদায়ী মাদ্রাসা এবং বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র। জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, এদের মধ্যে যে বৈষম্য বিরাজমান তার অবসান ঘটিয়ে সবার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে একই মান ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষা লাভের সুযোগ করা হবে। [জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০, পৃষ্ঠা-৩] অন্তত ৫০ বছরের ইতিহাসে বলা যায়, বিভিন্ন ধারার সমন্বয়ে এই উদ্যোগ এবং সকলের জন্য একই মানের পাঠ্যসূচি ও শিক্ষাক্রম দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে এমনটা আশা করা অনুচিত হবে না।

❑ প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এই শ্রেণীতেই অনুষ্ঠিত হবে প্রথম পাবলিক পরীক্ষা। ১৯৪৭ সালে করাচিতে পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে প্রাথমিক শিক্ষাকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করে তা ধীরে ধীরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এরপর থেকে যতগুলো শিক্ষা কমিশন বা শিক্ষা কমিটি হয়েছিল তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বর্ধিত করার সুপারিশ ছিল। কিন্তু যেহেতু কোন শিক্ষা কমিটির প্রস্তাবই সরকার কর্তৃক গৃহীত হতে পারেনি, তাই প্রাথমিক শিক্ষা গত ৫০ বছরে সেই ৫ম শ্রেণী পর্যন্তই আটকে আছে। এই সিদ্ধান্তটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, জাতীয় উৎপাদনশীলতায়ও এর প্রভাব পড়বে। কারণ পূর্বের ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করে প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই যারা বিদায় নিত তারা মূলতই বালক এবং এই বালকদের কোন বৃত্তিমূলক বা অন্য কোন পেশায় জড়ানো বয়সের কারণেই সম্ভব হতো না। এছাড়া ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করে ছেড়ে দিলে পরবর্তীতে চর্চার অভাবে লেখাপড়াটা ভুলে যাওয়াটাও স্বাভাবিক। অন্যদিকে, ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে কেউ স্কুল ছেড়ে দিলেও লেখাপড়াটা পরবর্তীতেও তার স্মৃতিতে থাকবে, আর ৮ম পাস একজন ছাত্র তখন কিশোর, যখন তাকে বৃত্তিমূলক পেশার পড়াশুনায়ও যুক্ত করানো সম্ভব এবং এতে তাদের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হবে। শিক্ষানীতিতে তাই ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত 'জীবন পরিবেশের উপযোগী কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষা' প্রদানেরও প্রস্তাব করা হয়েছে। [জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০, পৃষ্ঠা-৩]। (অসমাপ্ত)